রবীন্দ্রনাথের ছবি

মৃণাল ঘোষ

আমার আপনার মধ্যে এই নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য আছে বলেই আমার ভিতরে মুক্তির জন্যে এমন নিরন্তর এবং এমন প্রবল কান্না'। —১লা বৈশাখ ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (এপ্রিল ১৯২৭) নির্মল কুমারি মহলানবীশকে এক চিঠিতে এই কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ('পথে ও পথের প্রান্তে'। বিশ্বভারতী, কলকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৪০০, পৃঃ ৩৬) তাঁর শেষ পর্বের আধুনিকতাকে বুঝতে, শুধু শেষ পর্বেরই বা কেন, তাঁর সমগ্র সৃষ্টির ভিতর আধুনিকতার বিবর্তনকে বুঝতে এই 'নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য' কথাটির কিছু প্রাসঙ্গিকতা থাকে। সতেরো বছর বয়সে প্রকাশিত 'কবি - কাহিনী' (১৮৭৮) থেকে জীবনের শেষ প্রান্তের রচনা 'শেষ লেখা' (১৯৪১) পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টির যে বিরাট পরিক্রমা, সেখানে নানা বাঁক অতিক্রম করে ক্রমশই বিবর্তিত বা রূপান্তরিত হয়েছে তাঁর আধুনিকতার ভাবনা।

এই 'পথে ও পথের প্রান্তে'-রই আর একটি চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'কিছুকাল পূর্বে এমন একদিন ছিল যখন আমার মনের নিভৃত দেশে একটি পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল,' (পৃ. ৭২)। এই 'পূজার আয়োজন'-ই তখন তাঁর মধ্যে এক সংশয়হীন বিশ্বাসের আলো জ্বেলে রাখতে পেরেছিল। এই বিশ্বাসের আলো থেকেই তিনি বলতে পারতেন তখন, 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই-কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।' কিন্তু জীবন তো তাঁকে এক জায়গায় সুধু এক 'পূজার আয়োজন' -এর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকতে দেয়নি। 'তাঁর পরে নানা কঠিন চিন্তা নানা জটিল কাজ, নানা চিত্তবিক্ষেপ আমাকে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেছে— সে পথের নাগাল পাচ্ছি নে।' এই খেদ ব্যক্ত করেছেন, কবি পূর্বোক্ত উচ্চারণের অনুষঙ্গেই। (পৃ. ৭২)

'পূর্ণের প্রকাশ যে একদিন হবেই সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না গীতাঞ্জলি পর্বের গদ্যে ও পদ্যে'। বলেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। সে বিশ্বাস অটুট থাকবার কথা নয়, থাকেওনি। আইয়ুব বলেছেন, 'পরে সন্দেহের ঘনায়মান ছায়া দেখা যায়। বলাকা-য় সে ছায়া অত্যন্ত ক্ষীণ এবং প্রায় অলক্ষ্য, কিন্তু নবজাতক- এ এতই ঘনকৃষ্ণ যে ধ্রুবের আলো খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় না, দেখতে হ'লে চোখকে অভ্যস্ত করতে হয় ঐ কাব্যের নাক্ষত্রিক তিমিরে'। (আবু সয়ীদ আইয়ুব) আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ! দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ১৯৭১। পৃ: ১৮৬-৮৭)

'নবজাতক' - এর (১৩৪৫ আষাঢ়— ১৩৪৬ চৈত্র) কিছু আগেই লেখা হয়েছিল প্রান্তিক'- এর (১৩৪১ বৈশাখ ১৩৪৪ পৌষ) কবিতাগুলি। এই 'প্রান্তিক' -এরই একটি কবিতায় আমরা শুনতে পাই তীব্র অন্ধকারের প্রবাহের ভিতর দিয়ে সত্তার ভেসে যাওয়ার ধ্বনি। 'দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়/দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি/ নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা',- ('অবসন্ন চেতনার গোধুলিবেলা')। এই কবিতাটির রচনাকাল ৪ ডিসেম্বর, ১৯৩৭। কিন্তু তখন এই তমিস্রা - স্রোতের শূন্যতাই একমাত্র সত্য ছিল না তাঁর কাছে। স্মরণীয় এই কবিতার শেষ তিনটি লাইন— 'হে পূষণ তোমার আমার মাঝে এক।' যে 'বিরুদ্ধতা' বা দ্বান্দ্বিকতা, এই যে শূন্যতার ভিতর থেকেও পূর্ণতার রূপ গড়ে নেওয়ার জন্য অভীপ্সা, এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের আধুনিকতাকে বুঝে নিতে হয় আমাদের। তাঁর জীবনের শেষ কবিতা শেষ তিনটি লাইন স্মরণ করা যায়— 'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে— সে পায় তোমার হাতে— শান্তির অক্ষয় অধিকার।' মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' সত্ত্বেও এই প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হননি তিনি।

নিজস্ব আধুনিকতার চেতনা এই দ্বান্দ্বিকতার ভিতর থেকে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ছবি।

শিল্পের মধ্যে তথা সত্যের মধ্যে চিরকালের প্রকাশকেই সব সময় দেখতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। চিরকালের সঙ্গে ক্ষণকাল তথা সময়কালের একটি সংঘাত, শেষ পর্যায়ে বিশেষ করে, তাঁকে অনেক সময় খুব বিব্রত করেছে। তাঁর আধুনিকতার ভাবনাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। অমিয় চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখছেন (২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৫), 'তোমাদের ওখানকার আধুনিক কালকে আমার মনে হয় ক্ষণকালের একটা আকস্মিক উৎক্ষেপ, চিরকালের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ নিজের মধ্যে হঠাৎ চিরন্তনের সম্বল নিঃশেষ হয়ে এসেছে বলেই, নিজের দৈন্যকে নিয়েই জয়পতাকা বানাবার চেষ্টা করছে।' (চিঠিপত্র ১১। বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৭৩-৭৪)

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকেই আবার লিখছেন, 'কোনো একটা বড়ো উপদ্রবে মনের দর্পণ যখন বেঁকে চুরে গেছে, তখন তাতে সংসারের যে প্রতিবিম্ব ত্যাড়াবাঁকা হয়ে পড়ে তাতে চিরকালের মানুষের সহজ ছবি পাইনে, সব কিছুর সঙ্গে একটা ব্যঙ্গ মিশে থাকে— সেটা হয়তো সেই সময়কার ঐতিহাসিক মেজাজের একটা তীব্র পরিচয় দেয় কিন্তু সেটা সব সময়কার নয়।' (পূর্বোক্ত উৎস, পৃ. ২১১) যা সব সময়কার নয়, তাকে আধুনিকের সাধনার বিষয় বলেও মানতে চাননি কবি। বলেছেন, 'কিন্তু যা অস্বাস্থ্য, যা বিকার, যা মুদ্রাদোষ তা সাইকলজির বিষয়, তা কবিতার নয়। মানুষের বড়ো সাধনা সমস্ত জীবনকে শিল্পরূপ দিতে চেয়েছে, মর্ত্যকে বানাতে চেয়েছে স্বর্গের কল্পমূর্তিতে। ...আধুনিকতা অনেক সময় এই ইচ্ছাকে ছেলেমানুষি বলে অবজ্ঞা করে।'

(পূর্বোক্ত উৎস, পৃ. ২১২) চলতি আধুনিকতার সঙ্গে তাঁর আধুনিকতার এই এক বিরোধ তাঁর শেষ পর্যায়ের সৃষ্টিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

এই বিরোধকে তিনি এড়িয়ে যাননি কখনোই। ধ্রুবত্বের প্রতি অটুট আস্থা রেখেও খণ্ড অস্তিত্বকে নিয়ে পরীক্ষা - নিরীক্ষা করতে পিছপা হননি কখনো। 'যা অস্বাস্থ্য, যা বিকার' তা নিয়েও পরীক্ষা করেছেন। 'সাইকলজির বিষয়' - কেও সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। 'পুনশ্চ'র (১৯৩২) কবিতাগুলির কথা স্মরণ করতে হয় আমাদের। ভারতে হয় 'শেষের কবিতা'র (১৯২৯) মতো উপন্যাস বা 'বাঁশরী'র (১৯৩৩) মতো নাটকের কথা। প্রখর বাস্তবকে তুলে আনছেন কবিতায়। আধুনিকতার যে দিকটাকে নিয়ে তাঁর অনীহা সেদিকটা নিয়েই খেলছেন। নিজেরই বিরুদ্ধে নিজেকে দাঁড় করিয়ে তর্কে লিপ্ত হচ্ছেন। এভাবে তিনি বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছেন নিজের দীর্ঘ লালিত আধুনিকতার ধারণা থেকে। কিন্তু সময়ের বা পরিপূর্ণের ধারণা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন না কখনো। কিন্তু এই 'বিরুদ্ধতার দৌরাত্ম্য'কে নিজের জীবনে ও শিল্পচর্চায় সর্বাত্মকভাবে গ্রহণ করার ফলে আরো পরিপূর্ণতার দিকেই যাচ্ছে তাঁর সমগ্রতার ধারণা। বিরোধকে আত্মস্থ করেই তাঁর আধুনিকতা হয়ে উঠছে আরো দ্যুতিময়।

শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' বইতে রবীন্দ্রনাথের শেষ পনেরো বছরের সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে পরিক্রমা করে এই দ্যুতিময় আধুনিকতাকে আমাদের বোঝাতে চান এভাবে 'নিজের মধ্যে অনেকখানি জায়গা শূন্য রেখে তাই তিনি মিলনের দিকে এগিয়ে চলেন কেবলই, আত্মবলয়ভাঙা সেই যোগের মধ্যেই আছে তাঁর চিরকালীন আধুনিকতা, সমস্ত আত্মপরাভবের গ্লানি থেকে মানুষকে মাথা তুলতে শেখায় যে আধুনিকতা, অন্ধ প্রাণশক্তির প্রভুত্বকে তুচ্ছ করে দিয়ে কেবলই কোনো চিত্তশক্তির দিকে এগোতে চায় যে আধুনিকতা।' (শঙ্খ ঘোষ। নির্মাণ আর সৃষ্টি। রবীন্দ্রভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। ১৩৮৯, পৃ. ৩০৪)।

দুই

তাঁর ছবি তাঁর সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। স্বভাবতই তাঁর সমগ্র মনন - প্রক্রিয়ার সঙ্গেও। তাঁর ছবির আধুনিকতাও তাঁর বিশ্বদৃষ্টি - সঞ্জাত সামগ্রিক আধুনিকতাবোধ থেকে আলাদা নয়। আঙ্গিকের দিক থেকে তাঁর সাহিত্য ও চিত্রকলা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, কেমন করে 'কবি - রবীন্দ্রনাথকে চিত্রকর - রবীন্দ্রনাথ একটা নূতন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন।' (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী। কলকাতা। ১৯৮৪, পৃ. ৩০৩)।

ছবি আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন এক আকারের জগৎ World of gesture। ১৯২৮ সালে (১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) লিখছেন নির্মলকুমারী মহলানবীশকে, 'এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতেছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। ...আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ।[১] (পথে ও পথের প্রান্তে। পৃ. ৫৪) তাঁর ছবি আঁকার প্রক্রিয়াটা হয়ে উঠল কবিতা লেখার বিপরীত। কবিতায় বিষয় আসে আগে, তারপর আসে রূপ। ছবি আঁকার সময় আকার বা রূপের প্রক্রিয়া শুরু হয় আগে। 'রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে।' (পূর্বোক্ত উৎস। পৃ. ৪৮)। তারপর সেই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জেগে ওঠে রূপ। সেই রূপের সূত্র ধরেই বিষয় বা ভাবে পৌঁছনো।

বিনোদবিহারী দেখিয়েছেন, 'তাঁর শেষ জীবনের রচনা 'রক্তকরবী' (১৯২৫) থেকে শুরু করে 'শেষ লেখা' (১৯) পর্যন্ত সাহিত্যের ভাব ও ভাষা এই World of gesture -কে অনুসরণ করে চলেছে।' (চিত্রকথা, পৃ. ২০৩)। অর্থাৎ রূপ আসছে প্রথমে। রূপ নিয়ন্ত্রণ করছে ভাবকে। কথার ছন্দ পাচ্ছে তির্যকতা। রেখায় রেখায় যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয় যে, কৌনিকতা, সেই কৌণিকতা প্রাধান্য পাচ্ছে বলার ভঙ্গির মধ্যে। 'রাজা' (১৯১০) ও রক্তকরবী' (১৯২৬) এই দুটি নাটকের রাজা চরিত্রের মধ্যে তুলনা করেছেন বিনোদবিহারী। দেখিয়েছেন 'রাজা' নাটকের চরিত্রটি অনেক ভাবময়। স্পর্শময় বা শরীরময় নয় তত। যেন আলো দিয়ে গড়া। আর 'রক্তকরবী'র রাজা যেন পাথর কেটে গড়া এক প্রতিমা। আয়তনে ও তির্যক রেখার কৌণিকতায় অনেক বর্তুল। আকারের প্রাধান্য সেখানে।

'রক্তকরবী' লেখা হয়েছিল ১৯২৩ নাগাদ। 'রাজা' থেকে 'রক্তকরবী' — এই তেরো চৌদ্দ বছরের ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টিতে যেমন তেমনি ফর্ম - চেতনাকেও বিপুল পরিবর্তন এনেছিল। জগৎটা হয়ে উঠছিল 'আকারের মহাযাত্রা'। এই অনুভব থেকেই, চেতনার ভিতরে এই ফর্ম বা আকারের প্রাধান্যের বোধ থেকেই রবীন্দ্রনাথের ছবির সূচনা। ওয়ালেস স্টিভেন্স একটি কবিতায় লিখেছিলেন 'Not ideas about about things but thing itself' 'আইডিয়া' থেকে 'থিং ইটসেল্ফ' -এর দিকে যাত্রার মধ্যে আধুনিকতার অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুর স্বরাটত্ব ও বস্তুর আয়তনময়তার বোধ থেকেই সেজানের (১৮৩৯ - ১৯০৬) ছবিতে এসেছিল আধুনিকতার এক নতুন বোধ। ইম্প্রেশনিজম - উত্তর আধুনিকতার সূচনা সেখান থেকেই। ফর্ম ইটসেল্ফ বা আকারের স্বরাটত্ব অগ্রসর আধুনিকতার এক লক্ষণ। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনের কাজে পৌঁছেছিলেন এ

স্বরাটত্বের। রবীন্দ্রনাথ ছবি শুরু করলেন এই 'আকারের মহাযাত্রা' বা ফর্ম ইটসেল্‌ফ থেকে। তাঁর ছবির আধুনিকতার বৈশিষ্ট্য এখানেই। তাঁকে যে বলা হয় ভারতীয় চিত্রকলার প্রথম আধুনিক, এরও একটা কারণ হতে পারে এটাই। রবীন্দ্রনাথের ছবির ক্ষেত্রে 'আধুনিক' বলতে 'আধুনিকতাবাদ' বা 'মডার্নিজম' কথাটি প্রযোজ্য।

একটি বিষয় এখানে স্পষ্ট হওয়া দরকার। চিত্রকলার ভারতীয় আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের (১৮৭১-১৯৫১) হাতে। ১৯৮৭ সালে তাঁর 'কৃষ্ণলীলা' চিত্রমালার মধ্য দিয়ে। কী বৈশিষ্ট্য সেই আধুনিকতার? এই প্রথম ঐতিহাসিক অর্থে আধুনিক যুগের ভারতে এক শিল্পী তাঁর চিত্র রচনায় নিজস্ব ব্যক্তিত্বের আরোপ করলেন। আর সেই ব্যক্তিত্বের আরোপের মধ্য দিয়ে গড়ে তুললেন এমন এক রূপচেতনা যার মধ্যে তাঁর নিজের ঐতিহ্য ও নিজস্ব সংস্কৃতির পরম্পরা সম্পৃক্ত। অথচ যা সেই ঐতিহ্যের প্রসারণ নয় শুধু। ঐতিহ্যের সঙ্গে বিশ্বকে মিলিয়েই তা গড়ে তুলতে চেয়েছে শিল্পের এক জাতিগত আত্মপরিচয়। নিজস্ব এক আইডেনটিটি। এর আগে নিজস্ব রচনা প্রক্রিয়ার প্রতিফলনে ভাস্বর ছিল রবিবর্মার (১৮৪৮-১৯০৬) ছবিও। স্বদেশের জীবন ও পুরাণ থেকে বিষয় গ্রহণ করেছিলেন তিনিও। কিন্তু তাঁর রূপ ছিল ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতিরই প্রসারণ মাত্র। নিজস্ব বা জাতিগত কোনো আত্মপরিচয় ছিল না তার মধ্যে। তাঁর আধুনিকতা ছিল পাশ্চাত্য স্বাভাবিকতাবাদ আত্তীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ পর নব্য-ভারতীয় ঘরানার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে আমাদের চিত্রকলার আধুনিকতা। কিন্তু যে স্বদেশ -চেতনা থেকে এই আধুনিকতার উদ্ভব, তার অন্তর্লীন প্রেরণা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়েছে। রূপ-ভাবনা পর্যবসিত হয়েছে এক আভ্যাসিক সংস্কারে। শিল্পীর আত্মপরিচয় আবিল হয়েছে আবার। আধুনিকতার যাত্রা স্তব্ধ হয়েছে। মোটামুটি ১৯২০ পর্যন্ত নব্য - ভারতীয় ঘরানার আধুনিকতার যে দ্যুতি ছিল, তা স্তিমিত হয়েছে এরপর থেকে। অবশ্য তা আবার একটু পরে নতুন উদ্দীপনায় বিকশিত হয়েছে নন্দলাল বসুর (১৮৮২-১৯৬৬) চর্চার মধ্য দিয়ে এবং তাঁরই প্রভাবে শান্তিনিকেতনের চিত্রধারায়। সেখানেও রবীন্দ্রনাথের বিরাট অবদান ছিল।

১৯২০ -র পর থেকে যখন গতানুগতিকতায় স্তব্ধ হচ্ছিল নব্য - ভারতীয় রীতির আধুনিকতা, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর্ভাবনার কথা জানিয়েছেন বারবার। একদিন তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল নব্য ভারতীয় আঙ্গিকের আধুনিকতার উজ্জীবনে। অবনীন্দ্রনাথকে তিনিই প্রেরণা জুগিয়েছিলেন 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'কৃষ্ণলীলা' চিত্রমালার উদ্ভাবনে। হ্যাভেলের (১৮৬১-১৯৩৪) কার্যক্রমে সমর্থন করেছেন। এমনকী কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুল থেকে বিদেশি চিত্র সম্ভারকে সরিয়ে ফেলাতেও তিনি আপত্তি করার কারণ দেখেননি। মনে হয়েছিল তাঁর বিদেশের গৌণ ছবি নকল করে কোনো সৎ চিত্রবৃত্তি জাগবে না আমাদের উদীয়মান শিল্পীদের মনে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর উদ্দীপনা ও অবদানের কথাও অজানা নয় কারুর। সেই কার্যক্রম নব্য-ভারতীয় ঘরানার আঙ্গিক নির্মাণেও রসদ জুগিয়েছিল অনেক।

১৯১৫ সালে তাঁরই উদ্যোগে ও আর্থিক সহায়তায় জোড়াসাঁকোতে 'বিচিত্রা স্টুডিও' প্রতিষ্ঠিত হয়। নব্য-ভারতীয় ঘরানায় নতুন উদ্দীপনা আনার প্রয়াস ছিল 'বিচিত্রা' -র মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস সফল হয়নি। নতুন কোনো উদ্যম জাগেনি সেখান থেকে। বছর দেড়েক পরে ১৯১৭ -তে 'বিচিত্রা' বন্ধ হয়ে যায়। আধুনিক চিত্রের যে মুক্তি তিনি চাইছিলেন, 'বিচিত্রা' থেকেও যখন তা সম্ভব হল না, তখন নিজেই তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনে 'কলাভবন' প্রতিষ্ঠা করলেন ১৯৯১ সালের ৩ জুলাই। নন্দলালের উপর দায়িত্ব দিলেন কলাভবন রামকিঙ্করকে (১৯০৬-১৯৮০) তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন ভাস্কর্যের আধুনিক আঙ্গিক নির্মাণে।

'বিচিত্রা'-র কাছাকাছি সময় থেকেই তাঁর মনে অতৃপ্তি জাগতে শুরু করে নব্য - ভারতীয় চিত্ররীতির নানা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে। বুঝতে পারছিলেন তথাকথিত স্বদেশিকতার একটা আবেষ্টনীর মধ্যে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এই চিত্ররীতি, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বিশ্ব থেকে। জাপান থেকে ৮ ভাদ্র ১৩২৩ (১৯১৬) তারিখে অবনীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, 'আমাদের দেশের আর্টের পুনর্জীবন সঞ্চারের জন্য এখানকার সজীব আর্টের সংস্রব যে কত দরকার সে তোমরা তোমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখনই বুঝতে পারবে না। আমাদের দেশে আর্টের হাওয়া বয়নি। সমাজের জীবনের সঙ্গে আর্টের কোনো নাড়ির যোগ নেই— ওটা একটা উপরি জিনিস, হলেও হয় না হলেও হয়, সেইজন্য ওখানকার মাটি থেকে তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না।'

এর অল্প কিছুদিন পরে ১৭ আশ্বিন ১৩২৩ (১৯১৬) তারিখে জাপান থেকেই কন্যা মীরা দেবীকে লিখেছেন, 'আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্রকে অভিষিক্ত করবে কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলে না। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও তো প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম।' (রবীন্দ্রনাথ। চিঠিপত্র ৪। বিশ্বভারতী ১৩৫০, পৃ. ৭৯-৮০)। এই অতৃপ্তি থেকে এবং তাঁর এই বক্তব্য থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, প্রকৃত ছবি সম্পর্কে বা ছবির আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর কী ভাবনা ছিল। যে স্বদেশিকতায় একদিন তিনি সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, স্বদেশচেতনাকেই মিলিয়ে নিতে পেরেছেন আধুনিকতার সঙ্গে, আজ তাকে যথেষ্ট মনে করেছেন না। আজ তাঁর মনে হচ্ছে আর্টের সজীবতার জন্য প্রয়োজন সমাজের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে যোগ এবং বিদেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

আধুনিকতা স্বদেশ চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বিশ্বের সঙ্গে সংযোগেই ঘটবে তার উজ্জীবন। মীরা দেবীকে ওই চিঠি লেখার আট ন-বছর পর থেকে ধীরে ধীরে চিত্রবিদ্যা হয়ে উঠতে পারল তাঁর নিজেরও বিদ্যা। এবং কী তিনি করতে পারেন, তাও তিনি দেখালেন পৃথিবীকে। আমাদের আধুনিকতায় নতুন প্রয়াস সঞ্চার করলেন তিনি। দেখালেন চিত্রকলা একটা আন্তর্জাতিক ভাষা। সমগ্র বিশ্বই একজন শিল্পীর উত্তরাধিকার। ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিল্পকলা বিষয়ক এক বক্তৃতায় বলেছেন, বাইরে থেকে গ্রহণ করায় কখনো অবনমিত হয় না শিল্প। মাঝারি মাপের শিল্পীরাই অন্যের থেকে গ্রহণে লজ্জিত হয়। কেননা তাঁরা জানে না কেমন করে শোধ করতে হয় ঋণ। কোনো মূর্খ সমালোচকই শেক্স্পিয়রকে দোষারোপ করতে সাহস পায় না বাইরে থেকে গ্রহণের জন্য। তাঁর ভাষায় 'The sign of greatness in great genius is in their enormous capacity for borrowing very often without their knowing it; they, have unlimited credit in the world market of culture, (Rabindranath Tagore : The Meaning of Art, Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1983,p-15.)'

কাকে বলে শিল্পকলা— এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন উপরোক্ত ওই বক্তৃতাতেই। 'What is art? It is the response of man's creative soul to the call of the real.' (পূর্বোক্ত উৎস, পৃ. ১৪)। পাশ্চাত্যের শিল্পী রূপের অপূর্ণতা বা অসম্পূর্ণতাকে পূরণের দিকে নিয়ে যেতে চায়। আর প্রাচ্যের শিল্পীর কাছে বাস্তব ('real') আসে আদর্শায়িত পরিপূর্ণতার রূপে ('ideal form of fulfilment')। 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরি' -তে লিখছেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ তারিখে, 'ছবি বলতে আমি কি বুঝি সে কথাটাই আর্টিস্টকে খোলসা করে বলতে চাই। ...ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে 'চেয়ে দেখো' তাহলে মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে...সত্যকে উপলব্ধির পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে একটা অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতিকেই আমরা সুন্দরের অনুভূতি বলি। ...আর্টিস্ট তেমনি করে আমাদের চমক লাগিয়ে দিক। তার ছবি বিশ্বের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়ে বলুক, 'ওই দেখো, আছে।' সুন্দর বলেই আছে তা নয়, আছে বলেই সুন্দর।

'রূপ বিনা অর্থেই ভোলায়, দৃশ্যমান হয়ে ওঠা ছাড়া ওর আর কোনো দায়িত্ব নেই।' এ কথা বলেছিলেন নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে (১৯২৯), (দেশ, ৩০ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২৬৬)। যামিনী রায়কে লিখেছেন, ৭জুন ১৯৪১ তারিখে, 'ছবি কি— এ প্রশ্নের উত্তর এই যে— সে একটি নিশ্চিন্ত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী।...চিত্রকর গান করে না; ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে 'অয়ম অহম ভো'—এই যে আমি এই। (প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৭, পৃ. ৪০৬)।

যখন নিজের ছবির জগতে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ, তখন তাঁর কাছে ছবির আধুনিকতার নিরিখ হয়ে রইল এগুলো। একদিকে রূপের স্বরাটত্ব, আর একদিকে নির্দিষ্ট দেশ-কাল নিরপেক্ষ আবিশ্ব উত্তরাধিকার, এই মুক্তির মধ্যেই আধুনিকতার এক নতুন অভিধার সন্ধান পেলাম আমরা। আধুনিকতার এই মূল্যমান নিয়ন্ত্রণ করেছে ১৯৪০ -এর দশক পরবর্তী আমাদের চিত্রকলার স্বরূপ। স্বদেশচেতনা থেকে আন্তর্জাতিকতার দিকে উত্তরণ— এটাই অবনীন্দ্রনাথ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের চিত্রকলার আধুনিকতার বিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য।

অবশ্য এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বক্তৃতায় যে, ঐতিহ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যাওয়াও যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ঐতিহ্যকে উপেক্ষা বা অবহেলা করেও সম্ভব নয় শিল্পের বিকাশ বা আত্মপরিচয় অর্জন। বলেছেন, 'And yet we may go too far if we altogether reject tradition in the cultivation of art, and it is an incomplete statement of truth to say that habits have the sole effect of deadening our mind. The tradition which is helpful is like a channel that helps the current to flow,' (Rabindranath Tagore. The Meaning of Art. Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1983.P. 20)

এই স্বদেশ ও বিশ্বের সমন্বয়ের পথেই এগিয়েছে আমাদের পরবর্তী আধুনিকতা। রবীন্দ্রনাথের ছবিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাঁর ছবিতে আদিমতা ও জার্মান এক্সপ্রেশনিজনের অনুরণন আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রণবরঞ্জন রায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁর নিসর্গচিত্র নিয়ে এক আলোচনায়, যে তাঁর নিসর্গের ছবিতে প্রতিফলিত হয় চিরন্তন মানবতার যে আলো তা তাঁর জীবনের প্রতি বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি। শৈশবে শেখা উপনিষদের এই মন্ত্র 'অসতোমাসদগময়ঃ/ তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ'। (ললিত কা কন্টেম্পোরারি, ২৩ এপ্রিল ১৯৭৭। ললিতকলা অ্যাকাডেমি, নিউ দিল্লি, পৃ. ১০)।

প্রায় একই রকম বলেছেন, রতন পরিমুও তাঁর 'The sources and Development of Rabindranath's painting' প্রবন্ধ ও 'Yet it can be observed that in the visual work, the tragedy is pacified, calmness of the soul is retained, inspite of the bursts of innate creative energy...perhaps therin lies the Indian quality of his painting. While the vigour of his imges is a new quality including humour, but the tremendous feeling of pattern, for rhythm and for colour matching is again India. (Collection of Essays edited by Ratan Parimoo : 'Rabindranath Tagore : Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1987, P. 93)। তাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা ঐতিহ্য নিরপেক্ষ ইয়োরোপীয় আধুনিকতার অনুকরণ নয়।

।। তিন।।

কৃষ্ণ কৃপালনী তাঁর ইংরেজি রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে ১৯২২ সাল নাগাদ রবীন্দ্র জীবনের সৃষ্টি ও কর্মবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে একটু খেদ করে বলেছেন, তাঁর বিশ্বখ্যাতি, বারবার বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণের তাগিদ, বিশ্বভারতীর দায় ও তজ্জনিত চিন্তা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে যেন এনেছিল এক ভাঁটার টান। অনুমান করতে চেয়েছেন যদি এত ছড়িয়ে না পড়ত তাঁর জীবন, যদি না পেতেন তিনি নোবেল পুরষ্কার, যদি গীতাঞ্জলি পর্বের চেতনার সেই প্রশান্তিকে ধরে রাখতে পারতেন, তাহলে হয়তো আরো গভীরতর বাণী আমরা পেতে পারতাম তাঁর সাহিত্য থেকে। (দ্রষ্টব্য : Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore- A biography, Viswa Bharati, Calcutta, 1980, P.316-317)

এরকম ব্যস্ততা ও মানসিক চঞ্চলতার মধ্যেই তিনি শুরু করেছিলেন তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'রক্তকরবী'। 'এই তো সেই নাটক' শঙ্খ ঘোষের ভাষায়, 'যেখানে আমাদের চিনিয়ে দেওয়া হয় সমাজের কোন্ অবস্থায় অল্প কয়েকজনের সমৃদ্ধি একেবারে শিখরে ওঠে, অন্তর্বিরোধে ভেঙে পড়বার আগে...' (শঙ্খ ঘোষ 'কবির অভিপ্রায়', রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১০৯) আধুনিকতায় ধনতন্ত্রের তীব্র আস্ফালনকে কশাঘাত করছেন যখন রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠছে তাঁর নিজের জীবনেরও এক অশান্তির ছবি। মানসিক চঞ্চলতা ও আলোড়নের এই এই সময়েই কি সবচেয়ে সংহত, সবচেয়ে সমাজ ও জীবন সচেতন হয়ে উঠলেন না আমাদের এই কবি? ১৯২৩-এর এপ্রিলে গ্রীষ্ম কাটাতে শান্তিনিকেতন থেকে তিনি শিলং যান। সেখানেই 'রক্তকরবী'র শুরু। আর শেষ হয় সে বছরেরই শরতে পশ্চিম ভারত ভ্রমণের সময়।

রবীন্দ্রনাথের ছবির সূচনা - বিন্দু হিসেবে এই 'রক্তকরবী' খুবই প্রাসঙ্গিক। আধুনিকতার অন্তর্নিহিত সংঘাত থেকে জেগে উঠেছে এই নাটক। তাঁর ছবিও কি এই সংঘাতেরই ফসল নয়? কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। ছবির সঙ্গে 'রক্তকবরী'-র প্রত্যক্ষ যোগ এটুকুই যে, এরই একটি পাণ্ডুলিপি কাটাকুটির মধ্য দিয়ে আমরা পেয়েছিলাম তাঁর প্রথম পর্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি ছবি। 'আমার শেষরাগিণীর প্রথম ধুয়ো ধরলি রে, কে তুই?' এই গানটিকে ঘিরে কলমের আঁচড়ে কাটাকুটির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক ছবি। সাদা - কালোর তীব্রতায় এক যন্ত্রণাক্ত পশুর আর্তি গড়ে উঠছে যেন রেখার আঁচড়ে। আর গানটির মধ্যেও যেন পরোক্ষে ভেসে উঠছে তাঁর শেষ জীবনের ফসল, তাঁর চিত্রমালার আগমনবার্তা। 'আমার শেষ রাগিণীর প্রথম ধুয়ো', 'সন্ধ্যাতারার শেষ চাওয়া তোর', 'সন্ধ্যা হাওয়ার শেষ বেদনা', 'মরণপথের সাথি আমায় করলি রে, কে তুই'— এ সমস্ত বাকপ্রতিমা কি সে ইঙ্গিতই দেয় না?

পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির মধ্য দিয়ে গড়া প্রকৃত হল আর একটু পরে। ১৯২৪-এ 'পূরবী-র পাণ্ডুলিপির মধ্য দিয়ে।

'ওঁর একটি ছোটো খাতা টেবিলে পড়ে থাকত, ওরই মধ্যে কবিতা লিখতেন বাঙলায়। ...এই খাতা আমার বিস্মিত করল, মুগ্ধ করল। লেখার নানা কাটাকুটিকে একত্র জুড়ে দিয়ে তার ওপর কলমের আঁচড় কাটতে যেন মজা পেতেন কবি। এই আঁকিবুকি থেকে বেরিয়ে আসত সব রকমের মুখ, প্রাগৈতিহাসিক দানব, সরীসৃপ অথবা নানা আবোলতাবোল। ...কাকুতি করে বললাম, এর কয়েকটি পৃষ্ঠার ছবি তুলতে দিতে হবে আমায়। আমাকে খুশি করবার জন্য উনি রাজিও হলেন। এই ছোটো খাতাটিই হলো শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সূচনাপর্ব। ...ব্যাপারটায় ওঁকে উশকে দিলাম। সান ইসিদ্রোর ছ'বছর পর পারীতে যখন দেখা হলো কবির সঙ্গে, ওঁর ওই খেলা তখন দাঁড়িয়ে গেছে ছবিতে'। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নিজেরই লেখা থেকে আমরা পেয়ে যাই কবি রবীন্দ্রনাথের চিত্রী রবীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার প্রাথমিক পর্বের এক বর্ণনা। (শঙ্খ ঘোষ। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং কলকাতা। ১৯৮৩, পৃ. ৮৭-৮৮) ১৯২৪ -এর ৬ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন বুয়েনাস এয়ার্স-এ এবং এক মাস কুড়ি দিন কাটিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়ার আতিথ্যে। 'পূরবী'-র কবিতাগুলিই লেখা চলছিল তখন। সেই সূচনা থেকে ১৯৪১ -এ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এঁকেছিলেন প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি ছবি। এখানে মনে রাখা ভালো পাণ্ডুলিপির পাতায় কাটাকুটির শুরু কিন্তু অনেক আগেই। ১৮৭৮ -এ 'মালতীপুঁথি'র কাটাকুটির কথা স্মরণ করেন অনেকেই।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে বোঝার চেষ্টা করেছেন অনেকেই। বিনোদবিহারী চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। ১. রেখামূলক অলঙ্করণ, ২. গড়নযুক্ত অলঙ্করণ, ৩. গড়নের ক্ষেত্রে বস্তু-সাদৃশ্যের আবির্ভাব এবং ৪. সাদৃশ্যের প্রাধান্য। (বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ছবি। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা। ১৯৮৪, পৃ. ২৯৯)

রতন পরিমুও তাঁর ছবিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন কালানুক্রমে। প্রথম পর্যায়ে ১৯২৪ থেকে ১৯৩২, যখন রেখাতেই তিনি আঁকছেন মূলত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৩০-এর পর থেকে ১৯৩৫ -এর আগে পর্যন্ত। সাদা - কালো রেখার গড়ন ছাড়িয়ে তিনি রঙের ছবিতেও এসেছেন এই সময়। কিন্তু গাঠনিকতাই প্রাধান্য পেয়েছে। আর তৃতীয় বা শেষ পর্যায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১-এ তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। ছবি অনেক বর্ণনাত্মক হয়েছে এই সময় (Ratan Parimoo : The sources and the Development of Rabindranath's Paintings in Rabindranath

Tagore - Collection of Essays ed. Ratan Parimoo. Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1989, (p.28)। স্টেলা ক্রামরিশ রবীন্দ্রনাথের ছবির সমস্ত আঙ্গিকের মধ্যে দুটি প্রবণতা দেখেছিলেন। যাকে তিনি বলেছিলেন, 1. drop and shapes এবং 2. angles terminating in sharp points. (Stella Kramrich 'Form elements in the visual works of Rabindranath Tagore'. Lalit Kala Contemporary-2. Dec. 1964, LKA, New Delhi, p.37) সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্র - চিত্রকলা - রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা' গ্রন্থে (দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮২) বিষয়বস্তুর দিক থেকে তাঁর ছবিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন নিসর্গদৃশ্য, জীবজন্তু, মুখাকৃতি, নগ্নমূর্তি। কিন্তু এগুলি খুবই গৌণ বিভাজন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে বিমূর্ততা থেকে মূর্ততার দিকে এসেছিলেন, বিনোদবিহারী যাকে বলেছেন, 'রেখামূলক অলঙ্করণ', তা হল পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি থেকে উদ্ভূত ছবি। সেই অলঙ্করণ রৈখিক, গাঠনিক, স্থাপত্যধর্মী। এই গাঠনিকতা থেকে ক্রমে জেগে উঠেছে কিছু কিছু দৃশ্যমান রূপের আভাস। মোটামুটি ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর ছবিতে সাদা - কালোর এই গাঠনিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বশিল্পের পরিপ্রেক্ষিতেও এই পর্যায়ের ছবি ছিল এতই স্বাতন্ত্র্যময়, এতই সাহিত্য - নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ চিত্রগুণসম্পন্ন যে, এগুলিই চিত্রের আধুনিকতায় তাঁর একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

১৯৩০ -এর মে মাসে প্যারিসের গ্যালারি পিগেল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনী। তারপর সেই বছরই এই একই প্রদর্শনী ইয়োরোপ ও আমেরিকার আরো বারোটি শহরে দেখানো হয়। বলা যায় সারা পাশ্চাত্যেই বিপুল আলোড়ন এনেছিল এই প্রদর্শনী, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। চিত্রী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয় ঘটেছিল এই প্রথম চিত্র-সম্ভারের মধ্য দিয়েই। কী দেখেছিলেন পাশ্চাত্যের দর্শক তখন তাঁর ছবির মধ্যে? প্যারিস প্রদর্শনীর পরে অঁরি বিদুঁ-র আলোচনা থেকে এর কিছু আভাস পাওয়া যায়। বিদুঁ বলেছিলেন, 'একটি গোপন প্রতিভা নিদ্রিত ছিল— পরিকল্পনার নিশ্চিত দক্ষতা, tone -এর সৌন্দর্য, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের সজীবতা, মণ্ডলের জ্ঞান—সব এ কথাই প্রমাণ করে। মনের চেতনা স্তরের শক্তিগুলির অস্বাভাবিক স্ফুরণে এই গোপন শক্তিটি প্রকাশিত হতে পারেনি, তাই সারা জীবন এই প্রতিভাটি ছায়াচ্ছন্ন থেকে গেছে। ...একটি স্বয়ংক্রিয় বিবর্তনের ফলেই হোক কিংবা পরিচিত পৃথিবীর অস্পষ্ট স্মৃতির জন্যই হোক, শিল্পকর্মটি ধীরে ধীরে কোনো পরিচিত প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য গড়ে তুলতে থাকে। ...এই চিত্রগুলিকে তাদের গাণিতিক উপাদানে বিশ্লেষণ করলে দৃঢ়তা ও সত্যতার পরিচয় মেলে। অন্য সময় তাদের এমন এক করুণ প্রাণময়তা থাকে যা মনকে স্পর্শ করে। (সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৯)

গঠনের স্বাতন্ত্র্যই প্রাধান্য পেয়েছে এ লেখায়। ঝোঁক এসেছে সুররিয়ালিজমের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখানোয়। জার্মানিতে সবচেয়ে বেশি উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছে এই প্রদর্শনী। তাঁরা গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর ছবির এক্সপ্রেসনিজম-এর সঙ্গে সাযুজ্যের উপর। আমেরিকার বোস্টনে যে প্রদর্শনী হয়েছিল ১৯৩০-এর অক্টোবরে, তাতে স্মারকপত্রের ভূমিকা লিখেছিলেন কুমারস্বামী। তিনি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে শিশুচিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য দেখেছিলেন। এগুলিকে বলেছিলেন, 'genuine examples of modern primitive art.'

সেই থেকে সুররিয়ালিজম, এক্সপ্রেশনিজম, প্রিমিটিভিজম ইত্যাদির মাপকাঠিতেই বিচার হয়ে আসছে রবীন্দ্রনাথের ছবির। আর এই সূত্রে ফ্রয়েন্ডিয় মগ্নচৈতন্যে পৌঁছে যান কেউ। যেমন গিয়েছিলেন ডব্লু জি আর্চার তাঁর 'India and modern Art' বইতে। রবীন্দ্রনাথের ছবির উপর 'Art and the Unconscious' প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, 'The latent content, as we have seen, is almost always sexual-the shapes usually possessing visual affinities with phallus or vagina. (George allen & Untain Ltd. London প্রকাশিত, পৃ. ৭৬)।

আর্চারের বইটি বেরিয়েছিল ১৯৫৯ সালে। ১৯৫০ -এর দশকেও ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের আলোকে শিল্প - সাহিত্য বিচারের প্রবণতা গুরুত্ব পেত যথেষ্ট। আর মগ্নচৈতন্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষা ভূমিকা কিছুটা তো থাকেই শিল্পের ক্ষেত্রে। তবে কেবল লিঙ্গ ও যোনির প্রতিফলন দেখাটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে আরো বিস্তৃততর গবেষণা হয়েছে। তা থেকে এখন পর্যন্ত একটি বিষয় মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত যে, প্রিমিটিভিজম ও এক্সপ্রেসনিজমের অনেকটাই ভূমিকা রয়েছে তাঁর ছবির আঙ্গিকে। রতন পরিমুর গবেষণাই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি তথ্যসমৃদ্ধ, বিশ্লেষণাত্মক ও গভীরপ্রসারী। কিছুদিন আগে কেতকী কুশারী ডাইসন, সুশোভন অধিকারী ও আরো দুটি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীর যৌথ গবেষণার ফসল হিসেবে বেরিয়েছে 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' বইটি। (আনন্দ পাবসিশার্স, কলকাতা ১৯৯৭)। সকলেই এ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। আঙ্গিকগত এই অবস্থানের মধ্যে তাঁর ছবিতে স্বদেশ চেতনার একটা প্রচ্ছন্ন মাত্রার কথা বলেছেন রতন পরিমু। আমরা একটু আগে তার উল্লেখ করেছি। প্রণবরঞ্জন রায়ের সিদ্ধান্তের কথাও বলা হয়েছে। এর মধ্য থেকেই রবীন্দ্রনাথের ছবির টেগোর' বইটিও ('রুপা', কলকাতা, এলাহাবাদ, মুম্বাই ১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য।' রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের আলোচনা বইটির বৈশিষ্ট্য। সঙ্গে ছাপা হয়েছে তাঁর ছবির বেশ কিছু ভালো প্রতিলিপি।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় আঙ্গিকের দিক থেকে যে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন, রবীন্দ্রনাথের ছবিকে, তার মধ্যে প্রথম তিনটি ভাগে রেখার প্রাধান্য। রেখার গাঠনিকতায় স্থাপত্যধর্মী গুণে এই পর্যায়ের ছবির যে মৌলিকতা কবি-শিল্পীর সেটাই অবিস্মরণীয় অবদান। বিনোদবিহারী বলেছেন, ‘ রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের রচনা এবং তারই অনুরূপ রচনা যা তাঁর শিল্প বিবর্তনের নানাস্তরে ছড়িয়ে আছে সেগুলি শিল্পী রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় দান। ...রেখা, আকার, রূপ — এই তিনের স্বাধীন সত্তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় যেভাবে পাওয়া যায়, তার তুলনা আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পের ক্ষেত্রেও বিরল।’ (রবীন্দ্রচিত্রের ভিত্তি’, ‘চিত্রকথা, পৃ. ২৯৬)। রবীন্দ্রনাথের ছবির আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হতে পারে এটাই।

কিন্তু বিনোদবিহারী সংশয় প্রকাশ করেছেন তাঁর চতুর্থ পর্যায়ের ছবি সম্পর্কে যেখানে ‘আলোছায়ার মায়ার অনুকরণে’ তাঁর ছবি ‘বাস্তবতার দিকে ঝুঁকছে’। তাঁর মতে সেখানে ‘পূর্বকল্পিত গড়নের মায়াগণ্ডি সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারেনি বলেই বাস্তবতার চরম পরিণামে উত্তীর্ণ হয়নি।’ (পূর্বোক্ত উৎস, পৃ. ৩০১)। প্রায় একই রকম কথা বলেছেন দীনকর কৌশিকও। নন্দন। কলাভবন, শান্তিনিকেতন প্রকাশিত জয়ন্ত চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘ড্রয়িংস অ্যান্ড পেইন্টিংস অব রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থ (১৯৮৮) তাঁর প্রবন্ধ ‘রবীন্দ্রনাথ পেইন্টিংস : আ স্টাডি ইন ক্রোনোলজি’- এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন ১৯২৭ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত তাঁর সমগ্র চিত্র রচনার মধ্যে গোড়ার দিকের কাজ আঙ্গিকের দিক থেকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাঁর ভাষায়, ‘Thus, the early years are rich in colour, the themes have a touch of fantasy, strange drama and the handling of line or colour is firm, playful and full of experimental variations’ (পৃ. ১৯)। ১৯৩৩ থেকে ৩৫ -এর মধ্যে তাঁর যে ছবি, তাতে কৌশিকের মতে আগেকার কল্পরূপাত্মক উৎকর্ষ অনেকটাই কমে এসেছে। ১৯৩৫ -৩৬ এর পর তাঁর ছবির বর্ণিলতা কমে এসেছে, রেখার প্রত্যয়ী দৃঢ়তাও অবনমিত হয়েছে (’His line has been showing signs of vibration snd lack of steadiness.’ পৃ. ২০)।

দীনকর কৌশিক এবং রতন পরিমু দুজনেই আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ছবির কাল নির্ধারণ একটি বিশেষ সমস্যা। কেননা রবীন্দ্রনাথ যেমন ছবির নাম দিতেন না, তেমনি সব সময় সই করতেন না বা সই করলেও তারিখ দিতেন না। কৌশিক এবং পরিমু স্বাক্ষরের বিবর্তনের উপর নির্ভর করে সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ সই করতেন ‘শ্রী’ রবীন্দ্র’ বা শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’ বলে। ১৯৩২-এর মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে তাঁর স্বাক্ষরে ‘শ্রী’ বর্জিত হয়। ১৯৩২ -এর ৭ আগস্ট জার্মানিতে তার দৌহিত্র নীতিন্দ্র মারা যান। মনে করা হয়, শোকাহত রবীন্দ্রনাথ এর পর থেকেই স্বাক্ষ র থেকে ‘শ্রী’ বর্জন করেন। সম্পূর্ণ না হলেও তাঁর ছবির কাল - নির্ধারণের খানিকটা সুরাহা এ থেকে হয়েছে।

।। চার।।

‘দেখেছি গুরুদেবের ছবিতে লালের প্রাচুর্য, তবু নাকি লাল রঙ তাঁর চোখে পড়ত না’। এই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন রাণী চন্দ তাঁর ‘গুরুদেব’ বইয়ের স্মৃতিচারণায়। (বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১২৫) শুধু রাণী চন্দ কেন তাঁর ছবিতে লালের বর্ণান্ধতার কথা বলেছেন, আরো অনেকেই, বিনোদবিহারী পর্যন্ত।

নন্দলাল বসুর মতো বিদগ্ধ শিল্পীর কথাও প্রণিধানযোগ্য, যিনি খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন তাঁর ছবি। ‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’ গ্রন্থে ‘গুরুদেবের আঁকা ছবি’ নামের প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ‘তদুপরি রবীন্দ্রনাথের বর্ণরুচি এমন অভ্রান্ত আর এত পরিশীলিত যে, বর্ণসংগতিতে তাঁর কোথাও কোনো দুর্বলতা দেখা যায় না।’ আর এই অভ্রান্ততার কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, ‘বিভিন্ন পর্দায় দুটি ঘোর রঙও তিনি গায়ে গায়ে ব্যবহার করেছেন— গাঢ় নীল রঙের পাশে গাঢ়তর কালিমা। অথচ প্রয়োগনৈপুণ্যের গুণে প্রত্যেকটিতে চিত্ররূপের স্তরবিন্যাসকে স্পষ্ট করে তুলেছে বৈ একশা করেনি।’ তাঁর মতে বর্ণের এই উজ্জ্বলতাই ইয়োরোপে তাঁর ছবির সাফল্যের কারণ। আর এই উজ্জ্বলতার মধ্যে রয়েছে তাঁর প্রাচ্য বোধের প্রকাশ। তাঁর কথায়, ‘য়ুরোপে প্রথম যখন রবীন্দ্র চিত্র - প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় এই বিচিত্র এবং উজ্জ্বল বর্ণের ব্যবহার বিমুগ্ধ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। প্রাচ্য শিল্পীর কাজে এটাই প্রত্যাশিত ছিল।’ (‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’, বিশ্বভারতী, কলকাতা। ১৩৯২, পৃ. ২৪২)।

লালের প্রাচুর্য, বর্ণরুচির অভ্রান্ততা— এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অনেক বিদগ্ধ মানুষের আকৃষ্ট করলেও এই বিষয়ে একটা সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। তাঁর আংশিক বর্ণান্ধতার কথা, লাল রঙটা যে তিনি দেখতে পেতেন না, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন অনেক সময়। তাঁর এই আংশিক বর্ণান্ধতা বা প্রোটানপ চরিত্রের প্রতিফলন, তাঁর ছবিতে বা লেখায় কীভাবে পড়েছে, সরাসরি তা সব সময় বোঝা যায় না। রাণী চন্দের বা আরো অনেকের বিস্ময়ের কারণ এটাই।

সম্প্রতি এ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে। তা থেকে তাঁর ছবির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও উঠে এসেছে। ছবিতে তাঁর আংশিক বর্ণদৃষ্টির সীমাবদ্ধতার কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন স্টেলা ক্রামরিশ। ললিত কলা অ্যাকাডেমি, নিউ দিল্লি প্রকাশিত ‘ললিত কলা কন্টেম্পোরারি’, পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (ডিসেম্বর ১৯৬৪) রবীন্দ্রনাথের ছবি

নিয়ে তাঁর আলোচনায় তিনি বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ অংশত বর্ণান্ধ ছিলেন, লাল ও সবুজকে তিনি একই রকম দেখতেন। তা সত্ত্বেও, ক্রামরিশ বলেছেন, এ দুটি রঙের ব্যবহারে তাঁর মুন্সিয়ানার কোনো অভাব ছিল না। 'He used them with superb command' (পৃ. ৩৮)। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

শোভন সোম রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিস্তৃত লিখেছেন। তাঁর 'শিল্পী, শিল্প ও সমাজ' (অনুষ্টুপ ১৯৮২), 'তিনি শিল্পী' (বাণীশিল্প ১৯৮৫), এবং 'বিচিত্রের দূত' (অনুষ্টুপ, ১৯৯২)— এই তিনটি বইতেই রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে আলোচনা আছে। শেষোক্ত বইতে 'রবীন্দ্রনাথের ছবির রঙ ও তাঁর আংশিক বর্ণান্ধতা' নামের প্রবন্ধে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং এরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'কালো আর খয়েরির গাঢ় মাত্রায় ব্যবহার প্রটানপ্‌দের বৈশিষ্ট্য। প্রটানপেরা নীলের ব্যাপারে বেশি সংবেদনশীল এবং সেটাও রবীন্দ্রনাথের ছবিতে দেখা যায়। হলুদও তাঁরা উজ্জ্বল মাত্রায় দেখেন। এই এই বৈশিষ্ট্যও তাঁর ছবিতে দেখা যায়। তাঁর দৃশ্যের ছবিগুলিতে গাঢ় খয়েরি অনুপুঙ্খহীন জমাট পুঞ্জের মতো দেখা যায় (পৃ. ১২৬)।' আরো বলছেন, 'প্রটানপ হিসাবেই তাঁর ছবিতে কালো খয়েরি ইত্যাদি ওজনদার রঙের প্রাবল্য দেখা গেছে। বিনোদবিহারী যাকে 'উগ্র' বলেছেন, সেই মাত্রাধিক্যও প্রটানপ হবার কারণেই স্বাভাবিকভাবে হয়েছে।' (পৃ. ১২৯)। পাশাপাশি লাগানো দুটি উজ্জ্বল রঙকে আলাদা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ কাগজের সাদা ছেড়ে একটি রেখা ব্যবহার করতেন। একে অ্যান্টি লাইন বা বিরেখা বলেছেন শোভন সোম। দেখিয়েছেন এ বিরেখা তাঁর বর্ণদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা সমাধানের একটি উপায়।

সাহিত্যে ও ছবিতে তাঁর আংশিক বর্ণান্ধতার প্রতিফলন নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা করেছেন কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী তাঁদের 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' নামে সুবিশাল গ্রন্থে (আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭), এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। ললের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁদের মন্তব্য এরকম— 'রবীন্দ্রচিত্রসংগ্রহের সঙ্গে পরিচয় অন্তরঙ্গ হলে আমরা খেয়াল করি, এই বিশ্বে লাল যে নেই তা নয়, কিন্তু বিশুদ্ধ ঝলমলে লাল চোখে পড়ে না। যা সাধারণত চোখে পড়ে তা পোড়া লাল, অনেকটা মেরুন ধরনের, যা লাল - কালো বা লাল - খয়রি নিশে গিয়ে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়।' (পৃ. ৬৪৪) তাঁরা এও বলেছেন, দৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবিতে বর্ণের যে বৈভব এনেছেন, তাতেই শিল্পী হিসেবে তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় রয়েছে।

তাঁর বর্ণদৃষ্টির এই সীমাবদ্ধতা, রূপারোপে অভিব্যক্তির প্রাধান্য, আদিমতার অন্ধকার থেকে উঠে আসা রূপপুঞ্জ, এ সমস্ত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর ছবির নির্মাণের দিকটাই আমরা অনুধাবন করতে পারি। সেটাও যে প্রয়োজনীয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ছবি দেখতে দেখতে সৃষ্টির নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুপুঙ্খ যখন আমাদের চেতনাকে অনুরণিত করে, তখন এক গহন রহস্যের জগতে আমরা প্রবেশ করি। সেখানে আনন্দ ও বেদনার এক সংহত সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে জীবনের অপার রহস্য আমাদের সামনে উন্মোচিত হতে থাকে। তাঁর আগে আমাদের ছবিতে আলো - অন্ধকারের রহস্যলোকের নিগূঢ় তাৎপর্য এভাবে কখনো অনাবৃত হয়নি। সে রহস্যের ভিতর আমরা আমাদের সত্তাকে যেভাবে গড়ে নিতে পারি, তা এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করায়। রূপের অভিনবত্ব শিল্পের অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। সেই রূঢ় বাস্তব বা 'real' বা সত্যের ভিতরের রহস্যকে উন্মোচিত করে। রবীন্দ্রনাথের ছবির পর থেকে ছবির এই দিকটা সম্পর্কে আমরা অবহিত হয়েছি। একে কি বলা যায় এক অন্তর্লীন উন্মোচনের আধুনিকতা?

।। পাঁচ।।

'আমার ছবি এ দেশকে দেখাইনি। এখানে অধিকাংশ লোকই ছবি দেখতে জানে না, প্রথমেই দেখে এর চেহারাটা ভালো দেখতে কি না। দেখতে হয় এটা ছবি হয়েছে কি না, সে দেখা এমন করে দেখা তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। একটা নিয়ত অভ্যাস আর instinctive দৃষ্টি থাকা চাই, ছবি দেখা সকলের কাজ নয়। সেই জন্যেই আমি এখানে ছবি প্রকাশ করতে চাইনে, প্যারিসে ওরা দেখেছিল আমার ছবি, দেখার মতো করে। আমার ছবি এ দেশের জন্যে নয়।' জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে এরকম আক্ষেপ করেছিলেন একদিন রবীন্দ্রনাথ মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে। (মৈত্রেয়ী দেবী : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থম, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ১৩৬) শুধু যে একবারই, তা নয়। নিজের দেশের ছবির দর্শক সম্পর্কে এরকম অভিযোগ বা অভিমান অনেকবারই প্রকাশ করেছেন।

প্যারিসে প্রদর্শনী শুরু হতে তখনো এক মাস বাকি। রয়েছেন দক্ষিণ ফ্রান্সের কাপ মাত্যাঁয়। ছবি আঁকাতেই নিমগ্ন। সেখান থেকে ১ এপ্রিল ১৯৩০ তারিখে চিঠি লিখছেন কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে। একই আক্ষেপের প্রতিধ্বনি সেখানেও। 'পণ করেছি ''আমার জন্মভূমি' -তে ফিরিয়ে নিয়ে যাব না— অযোগ্য অভাজনদের স্থূল হস্তাবলেপ অসহ্য হয়ে এসেছে।' (চিঠিপত্র ১৬, বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, পৃ. ৩০)। এর প্রায় দু-মাস পরে, প্রদর্শনী শেষ হয়ে গেছে তখন প্যারিসের প্রদর্শনী হবে 'লন্ডন বামিংহাম প্রভৃতি জায়গায়', ২৭ মে, ১৯৩০ তারিখে লন্ডন থেকে সুধীন্দ্রনাথকে আবার লিখছেন, একটু যেন শ্লেষ মেশানো স্বরে 'প্যারিসে আমার চিত্রকীর্ত্তি স্বদেশে শ্রুতকীর্ত্তিরূপে হয়তো এতদিন পৌঁচেছে।...অতএব এবারে দেশে ফিরলে হয়তো একটা অভিনন্দনপত্র ও ফুলের মালা পাওয়া

যেতে পারে। কিন্তু একটা ছবিও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব না।' (পূর্বোক্ত উৎস পৃ. ৩১)। আগের চিঠিতে উল্টো কমা চিহ্নিত ''আমার জন্মভূমি'' কথাটি লক্ষণীয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান থেকে উদ্ধৃত এই শব্দদুটি নিজের দেশ সম্পর্কে বিদ্রুপার্থে তিনি অনেক সময়ই লিখতেন নানা চিঠিতে। দেশ সম্পর্কে এমনই একটা অভিমান তৈরি হয়েছিল তাঁর।

এ কথা ঠিকই সেই সময়ের পক্ষে তাঁর ছবি দশের মননের প্রবাহের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে ছিল। কিন্তু এর সম্ভাবনার কথা কেউ যে একেবারেই কিছু অনুভব করেনি, তা তো নয়। অবনীন্দ্রনাথের সেই 'ভলক্যানিক ইরাপশানে'র কথা তো আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্পর্কে এত ভালো উপলব্ধির কথা খুব কি আর বলা হয়েছে? অবনীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তির কথাও আমরা জেনেছি সুভো ঠাকুরের এক লেখা থেকে। প্যারিস প্রদর্শনীর আগেই রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে এসেছেন তাঁর ছবির সম্ভাব। কিশোর সুভো ঠাকুর তখন সেখানে উপস্থিত। তাঁর ভাষাতেই আমরা শুনতে পারি অবনীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া : 'শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি দেখতে দেখতে আশ্চর্যে আঁৎকে ওঠার মতোই আত্মহারা হয়ে তখন বলে উঠেছিলেন— ''একি করেছ, রইক্কা, এ যে দেখছি এক্কেবারে সাঙঘাতিক —ছবির জগৎ এক্কেবারে ওলটপালট কোরে দেবে যে।'' (১৯৮৩-র ৫ থেকে ২৪ এপ্রিল কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমিক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী স্মারক পত্রে প্রকাশিত সুভো ঠাকুরের এই লেখা।)

নন্দলাল বসুর প্রতিক্রিয়ার কথাও আমরা জেনেছি। অমৃতা শেরগিল ১৯৩০ -এর প্যারিস প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, এমনকী তাঁর কবিতার থেকেও ববীন্দ্রনাথের ড্রয়িং বেশি পছন্দ তার। (আর্চার : 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড মডার্ন আর্ট', . ৮৩।) এরকম আরও অনেক ভালো লাগা যে ছিল না অনেক মানুষের, তা নয়। তবু সাধারণভাবে স্বদেশ তখন বুঝতে পারেনি তাঁর ছবি, এ কথা ঠিক। রবীন্দ্রনাথের ঈষৎ উষ্মা তাই অকারণ নয়। কিন্তু বিদেশেও কি সকলে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ছবি? কই এজরা পাউন্ডের (১৮৮৫-১৯৭২) কথা জানি আমরা। ইয়োরোপের প্রদর্শনীর অনেক পরে একবার বলেছিলেন তিনি, 'I remember when Tagore had taken to dooding on the edge of his proofs, and they told him it was art. There was a show of it in Paris. "Is this art?" Nobody was very keen on these doodlings, but of course so many peple lied to him.' রমা রল্যার কথাও জানি। তিনিও খুব খুশি ছিলেন না রবীন্দ্রনাথের ছবি বা ইয়োরোপের প্রদর্শনীর বিষয়ে। বলেছিলেন : 'ছবিগুলো ইউরোপে যে অভ্যর্থনা পেয়েছে, তাতে তিনি বুঁদ হয়ে আছেন। এর মধ্যে স্নবারি ও মিথ্যা ভদ্রতার অংশ যে কতখানি, তা তিনি ধরে উঠতে পারেননি।' (দুটি উদ্ধৃতিই শঙ্খ ঘোষের 'ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ' থেকে নেওয়া, দে'জ পাবলিশিং কলাকাত ১৯৮৩, পৃ. ১৮২)।

ইয়োরোপে প্রদর্শনীর পর এরকম আরও একটি বিদ্রূপাত্মক বিরূপ সমালোচনার উল্লেখ পাই কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারীর 'রঙের রবীন্দ্রনাথ' বইতে (পৃ. ৭০৫-৭০৬)। জেনিভার লাথেনে গ্যালারিতে প্রদর্শনীর পর আলোচনা লিখেছিলেন L. Florenin নামে একজন ১৯৩০ এর ২ সেপ্টেম্বর তারিখে। তাঁর বক্তব্য ছিল এরকম, 'এদের (রবীন্দ্রনাথের ছবির) শিল্পমূল্য সমস্যাবিজড়িত, ছন্দোগুণ ক্ষীণ, নূতনত্ব আপেক্ষিকমাত্রা।...শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং এই মনঃসমীক্ষণের দিক থেকে দেখলে এই কাজগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের একটা মানে করা যায়, হ্যাঁ, এই আকারগুলির, যাদের মধ্যে মিশেছে কিছুটা ছেলেমানুষি, কিছুটা বর্বরতা, এবং একটা পাশ্চাত্য ঘেঁষা তথা আধিগ্রস্ত পরিশীলন এবং সেই মিশ্রণ যে সর্বদাই কোনো সুসমঞ্জস সমগ্রকে জন্ম দিয়েছে এমন বলা যায় না। রহস্যাচ্ছন্ন ভূতুড়ে অন্তঃস্থ সত্তার অনুপ্রাণনায় করা কাজ গোলমেলে তো হবেই।'

এই ছিল তখন। গ্রহণ বর্জন মেশানো ছিল। আর এখন? পাশ্চাত্যে কি খুব একটা নতুন মূল্যায়ন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছবির? ১৯৮০ -র দশকে 'ক্রটিক্যাল কনফিউশান' -এর কথা বলেছেন, অ্যান্ড্রু রবিনসন তাঁর পূর্বোক্ত বইতে (পৃ. ৬৭)। তার পরেও কি বিশেষ উন্নতি হয়েছে মূল্যায়নে। বরং আমাদের দেশে ১৯৪০ -এর দশকের পর থেকে চিত্রী রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছেন আমাদের শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে এম এফ হুসেনের উচ্ছ্বাসের কথা কে না জানে? প্রদোষ দাশগুপ্ত, গোপাল ঘোষ, সুভো ঠাকুর, পরিতোষ সেন— এরকম আরও অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর ছবিতে। ১৯৬০ -এর দশকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত শিল্পীদের অনেকেই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ছবি থেকে। গণেশ পাইনের ছবি একটা পর্যায়ে এই প্রভাব যথেষ্ট গভীরপ্রসারী ছিল। এই প্রজন্মের একজন শিল্পী অবশ্য নীরক্ত বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের ছবিকে একটি দৈনিকের সাক্ষাৎকারে। কিন্তু সে কি তাঁর প্রভাবের বাইরে আসার একটা প্রচেষ্টাতেই নয়? আসলে সংশয়দীর্ণ অস্তিত্ব থেকে, ভালো মন্দের সংঘাত থেকে যে আধুনিকতা জন্ম নেয়, আমাদের চিত্রকলা সেই আধুনিকতার প্রথম পথিকৃতের মর্যাদা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ -এর দশকের পর থেকে।

কিন্তু শুধুই কি সংশয়দীর্ণ, দ্বিধাপন্ন চেতনার আধুনিকতা? এ কথা ঠিক শেষ পর্বে সত্যের স্বরূপকে তত নির্দ্বন্দ্ব, তত অমলিন দেখেননি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্যে এর পরিচয় আছে। ছবিতে এ পরিচয় আরো প্রগাঢ়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। তাঁর আত্মপ্রতিকৃতিগুলিতে যে 'আমি'-র রচনা করেছিলেন তিনি, সেগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবে উঠে

আসে গভীরতর এই অন্তর্লোকের প্রতিফলনের প্রতিচ্ছবি।

এরকমই একটি আত্মপ্রতিকৃতি সম্পর্কে লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'নির্মাণ আর সৃষ্টি' বইয়ের 'ছবি' অধ্যায়ের শুরুতে : 'কালো পাথরের বুক ভেঙে যেন নেমে আসছে আগুনের ঢল...'। (পৃ. ৬৮)। আর সেই সুত্রে উল্লেখ করেছিলেন 'পত্রপুট' - এর একটি কবিতার : 'বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে / ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝর্ণা রাত্রিদিন।' পঁচাত্তর বছর বয়সে ২৪-০৪-১৯৩৬ তারিখে আঁকা এই ছবিটিতে চারপাশের পরিব্যাপ্ত গাঢ় সবুজ অন্ধকার ভেদ করে আগুনের হল্কার মতো, অনেকটা অগ্নি-উদ্গীরণের লাভা স্রোতের মতো, লালাভ হলুদ প্রবাহিত হয়ে গড়ে তুলেছে তাঁর মুখ। ক্ষোভ, বিষাদ, উৎকণ্ঠা— এরকম কোনো শব্দ দিয়েই এই অভিব্যক্তির সঠিক স্বরূপ ধরা যায় না। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা, থমথমে এক প্রশান্তিও মিশে আছে এর মধ্যে।

এরই বছর খানেক আগে ১ আষাঢ় ১৩৪২ (১৯৩৫) তারিখে চন্দননগরে বসে আঁকা আর একটি আত্মপ্রতিকৃতির কথাও মনে আসছে আমাদের। গভীর কালচে বাদামি রঙের ছোপে মাঝে মাঝে অল্প অল্প কাগজের সাদা ছেড়ে গড়ে তোলা এই মুখাবয়বটিতে উপর থেকে নীচে বা আলম্বভাবে তুলির দৃপ্ত চলন গড়ে তুলেছে ঋজু, দৃঢ়তাময়, সুঠাম এক অবয়ব। যেন অন্ধকার দিয়ে গড়া এক ভাস্কর্য। অন্ধকারে আলিপ্ত এক মুখ যেন আলোর অভীপ্সায় উন্মুখ। শরীরের সুস্থতা হারিয়ে যাচ্ছে, যুদ্ধ আর জাতিবৈরিতে বিধ্বস্ত পৃথিবীতে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জয়যাত্রায় উপর আস্থা, এক সংকটে ব্যাপ্ত হযে আসছে পৃথিবী, এরকম এক আঁধারলীন পরিস্থিতিতে জীবনের আনন্দ স্বরূপের জন্য তীব্র উন্মুখতা চেতনার মধ্যে যে সংঘাত তৈরি করে, সেই সংঘাতকেই রূপ দিতে চেয়েছেন কবি নিজের মুখের এরকম চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে।

এই আত্মপ্রকৃতি দুটি বা এরকম আরো দু-একটি আত্মপ্রতিকৃতির ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তর্জগতের যে ছবি ফুটে ওঠে তা আমাদের অনেকটাই বুঝতে সাহায্য করে পরিণতপর্বে তাঁর চেতনার গহন স্বরূপকে। শুধুই সংশয়দীর্ণতা নেই এর মধ্যে। নেই শুধু দ্বিধাপন্নতা। এর সঙ্গে মিশে আছে আজন্ম লালিত তাঁর ঔপনিষদিক চেতনার সূক্ষ্ম কিছু আলোকরশ্মিও।' এই আলোকরশ্মির জোরেই ভেঙে পড়া বিশ্বের প্রকট আর্তনাদের মধ্যেও তিনি বলতে পেরেছিলেন, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। যে'নানা বিরুদ্ধতার বিষম দৌরাত্ম্য' -এর মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে আজীবন, তা তাঁকে শুধুই সংশয়দীর্ণতা বা দ্বিধাপন্নতা দেয়নি, মানুষের হয়ে ওঠার এক অম্লান আলোর সন্ধানও দিয়েছে। তাঁর ছবিতে তিনি জীবনের এই রহস্যকেই নানাভাবে উন্মোচিত করতে চেয়েছেন। ছবির আধুনিকতা এই বিরুদ্ধতার সংঘাত থেকেই জেগে উঠেছে এবং এই সংঘাতের পরপারে যে আলো আছে, তারই ধ্যানে মগ্ন থেকেছে।

চেতনার গভীর অন্তর্লোককে, তার ভিতরের আলো - আধাঁরের দ্বন্দ্ব নিয়ে, কেউ এভাবে তুলে আনতে পারেননি ছবিতে তাঁর আগে, অন্তত আমাদের দেশে। এ জন্যই তাঁকে বলা হয় চিত্রকলার প্রথম আধুনিক অন্তর্লোকের সংঘাত থেকে জাত যে আধুনিকতা, সেই আধুনিকতার প্রথম রূপকার।

।। তথ্যসূত্র ও সহায়ক উৎস।।

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পথে ও পথের প্রান্তে বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ। কলকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৪০০।

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র ১১। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা । ১৯৭৪।

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র ১৬। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা । ১৯৯৫।

৪। নন্দলাল বসু। গুরুদেবের আঁকা ছবি। দৃষ্টি ও সৃষ্টি। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা । ১৯৯২।

৫। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র - চিত্রের ভিত্তি, রবীন্দ্রনাথের ছবি, রবীন্দ্রনাথের ছবি ও সাহিত্য। চিত্রকথা। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৯৮৪।

৬। রাণী চন্দ। গুরুদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। কলকাতা । ১৯৯৪।

৭। মৈত্রেয়ী দেবী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থম, কলকাতা। ১৩৬৭।

৮। আবু সয়ীদ আইয়ুব। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৭১।

৯। শঙ্খ ঘোষ। ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাত, ১৯৮৩।

১০। শঙ্ঘ ঘোষ। নির্মাণ আর সৃষ্টি। রবীন্দ্রভবন। বিশ্বভারতীয়, শান্তিনিকেতন, ১৯৯১।

১১। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র চিত্রকলা, রবীন্দ্র সাহিত্যের পটভূমিকা। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮২।

১২। শোভন সোম। শিল্পী শিক্ষা ও সমাজ অনুষ্টুপ। কলকাতা, ১৯৮২।

১৩। শোভন সোম। তিনি শিল্পী। বাণীশিল্প। কলকাতা, ১৯৮২।

১৪। শোভন সোম। বিচিত্রের দূত। অনুষ্টুপ। কলকাতা, ১৯৯২।

১৬। কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী। রঙের রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ পাবলিশার্স। কলাতা, ১৯৯৭।

১৭। সুভো ঠাকুর। একটি দুর্লভ সুযোগের সুদুর্লভ অধিকারী। বিড়লা অ্যাকাডেমি, কলকাতা আয়োজিত ৫ থেকে ২৪ এপ্রিল, ১৯৮৩ -তে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনীর স্মারকপত্রে অন্তর্ভুক্ত।

১৮। Rabindranath Togore. The Meaning of Art. Lalit Kala Akademi, New Delhi. 1983

১৯। krishna Kripalani. Rabindranth Tagore, A Biography. Visva - Bharati Calcutta. 1980.

২০। Andrew Robinson. The Art of Rabindranath Tagore. Rupa & Co. Calcutta Allahabad Bombay 1989.

২১। (a) Ratan Parimoo. The Sources and the development of Rabindranath's paintings. (b) K. G. Subramanyan. Tagore-The poet Painter and the west in Rabindranath Tagore. Collection of Essays' Edited by Ratan Parimoo. Lalit Kala Akademi, New Delhi, 1989.

২২। D.R. Kowshik, Rabindranath's Paintings ` A study in chronology, in 'Drawings and Paintings of Rabindranath's Edited by Jayanta Chakroborty, Nandan, Kala Bhavana, Santiniketen. 1988.

২৩। (a) K. G. Subramanyan, Rabindranath Tagore and Modern Indian Art. (b) Partha Mitter. Tagore's Generation. views His Art. (c) Lokenath Bhattachary. Paintings of Rabindranath Tagor : A Brach - Taking Dimension of a Totality. in 'Rabindranath Tagore in Perspective A bunch of Esseys'. Visva - Bharati, Calcutta 1989.

২৪। Stella Kramrich form Elements in The Visva! work of Rabindranath Tagore. in Lalit kala Contemporary. 2 December 1964. Published by Lalit Kala Contemporary. 2 Decmber 1964. Published by Lalit Kala Akademi, New Delhi.

২৫। Pranabranjian Ray. Approach to Landscape - Rabindranath Tagore. in Lalit Kala Contemporary 23, April 1977.